Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January –June, 2023

বঙ্গভঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভূমিকা

ড.ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু,

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ইতিহাস বিভাগ,

বি.বি. কলেজ, আসানসোল।

১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং তাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভূমিকা নিয়ে ইদানিং বেশ চর্চা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে একটি নির্ধারক চরিত্র, হিসাবে তুলে ধরার একটা বিশেষ তাগিদও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তথাগত রায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে 'Architect of West Bengal' বলেছেন[1] এবং এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি নতুন বয়ান তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত দেশভাগ নিয়ে যে সমৃদ্ধ ইতিহাসচর্চার ধারা গড়ে উঠেছে তা এই বয়ানটির সঙ্গে মেলে না।

প্রথমেই যেখানে খটকা লাগে তা হল লক্ষ লক্ষ বাঙালি যাঁরা দেশভাগের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন তাঁরা ১৯৪৭ এর বঙ্গবিভাজনকে কি বিজয় হিসাবে দেখেছিলেন? স্বাধীনতার বিজয়োৎসব কি তাঁরা মন থেকে পালন করতে পেরেছিলেন? স্বাধীনতার আনন্দ কি ম্লান হয়ে যায় নি দেশভাগের বেদনায়? বাঙালি উদ্বাস্তুদের স্মৃতিচারণায় বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে ভিটে-মাটি, স্বজন ও পরিচিত পরিমন্ডল হারানোর যন্ত্রণা। শুধু তাই নয় যে কাল্পনিক হোমল্যান্ডের স্বপ্ন তাদের দেখানো হয়েছিল বাস্তবের থেকে তার ফারাক কতটা ছিল পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। বঙ্গবিভাজনের পক্ষে প্রচারের সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা যে একটা বড় ভাঁওতা ছিল তা তারা তাদের জীবন দিয়ে অনুভব করেছিল। তাই সরকার যখন উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনকে নেহাতই সরকারী দয়া দাক্ষিণ্য বলে ভাবতে বসেছিল, তখন উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতৃবর্গ দাবী করেন যে এটা তাদের অধিকার। কারণ পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January –June, 2023

যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের জীবন জীবিকা সুনিশ্চিত করা হবে। সেই আশায় বুক বেঁধেই তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'উদ্বাস্ত' কবিতার ভূষণ পালরা সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে তাদের 'নিজের দেশে'র সন্ধানে, গোটা বিষয়টিকে তারা প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হিসাবেই দেখে। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর সেই নিদারুণ দুর্ভোগের সাক্ষী থেকেছে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গ। তাই এই বিভাজন বাস্তব হলেও তাকে মন থেকে মেনে নেওয়া বা বিজয় বলে ভাবতে পারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে শক্ত ছিল। আজ সাত দশক পার করে সেই ট্রাজিক পরিণতিকে বিজয়দিবস হিসাবে পালন কি নিষ্ঠুর পরিহাস নয়?

দ্বিতীয়তঃ এনিয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গবিভাজনের পক্ষে আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া এই আন্দোলন কি সারা বাংলায় বিস্তার লাভ করতে পারত? হিন্দু মহাসভার সংগঠন ও গণভিত্তি সেসময় অত্যন্ত দুর্বল ছিল। বাংলা আইনসভার নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভার প্রাপ্তি ছিল মাত্র দুটি আসন। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা একটি আসনেও জয়ী হয়নি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও কংগ্রেস প্রার্থী নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জিতে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে [2]। ১৯৪৫-৪৬ এর নির্বাচনে পরিষ্কার হয়ে যায় যে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটাররা হিন্দু মহাসভা নয়, কংগ্রেসের উপরই আস্থাশীল ছিল। তার কারণ এসময় বাংলা কংগ্রেস অনেকটাই নিজেকে বদলে ফেলেছিল [3]। ফলে হিন্দু মহাসভা অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় বঙ্গ রাজনীতিতে।

তিরিশের দশকে বাংলার কংগ্রেস সংগঠনে বসু পরিবারের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। কংগ্রেসের কাজকর্মের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী ঝোঁক ছিল খুব পরিষ্কার। তবে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হবার ফলে কংগ্রেসের একটা বড় অংশ দলের কাজকর্মের প্রতি আস্থা হারায়। এই শূণ্যতা পূরণ করে হিন্দু মহাসভা যা ১৯৩৯ সালে বাংলায় নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দু মহাসভা বাংলার রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে অনেকেই এসময় মহাসভার পাশে এসে দাঁড়ায়। কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিন্দু মহাসভার তহবিলে মোটা অংকের সাহায্য দিতে শুরু করে। গ্রামের ও মফস্বলের ধনী ও জমিদাররাও মহাসভার পাশে এসে দাঁড়ায়। এমনকি কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি প্রভাবশালী অংশও হিন্দু মহাসভার কাছে চলে আসেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নলিনী রঞ্জন সরকার[4]। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরোধ এবং তার পরিণতিতে সুভাষের কংগ্রেস ত্যাগ বাংলায় কংগ্রেসের রক্ষণশীল আংশটিকে আরও শক্তিশালী করে। এরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কংগ্রেসকে একটি রক্ষণশীল ও প্রায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে পরিণত করে। ফলে হিন্দু মহাসভা থেকে পালের হাওয়া সরে যায়। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার এড়াতে যেসব কংগ্রেস কর্মী হিন্দু মহাসভার সদস্য হয়েছিল তারাও আবার ঘরে ফিরে আসে কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January –June, 2023

পর। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মহাসভার সংগঠন গড়ে ওঠেনি সেভাবে। কংগ্রেসের উপর নির্ভর করেই মহাসভা চলত। শ্যামাপ্রসাদ নিজেও কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনের আগে আসন সমঝোতার জন্য শরৎ বসুর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চালান। যদিও সেই আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসু হয়নি। শরৎ বসুর সঙ্গে নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাবেন না বলে তিনি কলকাতা শহরতলি থেকে নির্বাচন লড়েন, বর্ধমান বা কলকাতা থেকে না লড়ে[5]। এমন কি তাঁর অনুগামীদের অনেকেই তাঁকে সেসময় কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁদের মনে হয়েছিল আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে হিন্দু মহাসভার আর প্রয়োজন নাই। মহাসভার কাজটা কংগ্রেসই করতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা একে একে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে কংগ্রেসের প্রতি ঝোঁকে[6]। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনের আগেই শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেসময় তাঁর সহকর্মীরা কেউই তাঁর হয়ে নির্বাচনী লড়াই এ ঝাঁপিয়ে পড়েননি। সেই হতাশার কথা তিনি তাঁর ডায়েরিতে সবিস্তারে লিখেছেন। অসুস্থতার সময় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও তাঁকে দেখতে এসে কংগ্রেসে যোগ দিতে অনুরোধ জানান। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফল যে হিন্দু মহাসভার পক্ষে যাবে না সেটাও নিশ্চিত হয়ে যায়। যথারীতি কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা বেশীদূর এগোয়নি। শ্যামাপ্রসাদ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৬ ডায়েরিতে লিখেছেন, "প্যাটেলের সঙ্গে কথা হল চিঠি লেখা হল---কংগ্রেসের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া সম্ভব হল না। তাঁরা ভাবেন হিন্দুসভার পিছনে তেমন জনমত নেই। তা প্রমাণ হল কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচন নিয়ে। সুতরাং এখন তাঁরা মিটাতে চাইবেন কেন?"[7] মার্চ মাসে (১৯-২২) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হিন্দু মহাসভার কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জিতে আসতে পারে নি। শ্যামাপ্রসাদ জিতে আসেন আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনক্ষেত্র থেকেই। ১৯৪৫-৪৬ এর নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ছিল পরিষ্কার। মুসলিম ভোটের সিংহভাগ যেমন লীগের ঝুলিতে পড়েছিল তেমনি হিন্দু ভোট পড়েছিল কংগ্রেসের ঝুলিতেই পড়েছিল। হিন্দু মহাসভাকে নির্বাচকরা কার্যত বিবেচনার মধ্য আনেনি।

তবে কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা পরিস্থিতি আমূল বদলে দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলার রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া হিন্দু মহাসভাকে আবার প্রাসঙ্গিক করে তোলে। ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই বাংলাভাগের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে যাতে হিন্দু মহাসভা আবার বাংলার রাজনীতিতে সামনের সারিতে চলে আসে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে সম্মতি জানায় এবং সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে এই আন্দোলনকে পুষ্ট করে। তবে মনে হয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও এনিয়ে যথেষ্ট দোটানা ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে, অন্তত একটি সংখ্যালঘিষ্টঅংশের মধ্যে। সেই কারণেই কংগ্রেস সামনে থেকে এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি। বাংলায় কংগ্রেস সংগঠনে শরৎ বসু ও তাঁর অনুগামীদের একচ্ছত্র আধিপত্য তখন না থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও শক্ত ছিল। তাই কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সামনে রেখে পিছন থেকে আন্দোলনকে সাংগঠনিক শক্তি জোগায়। প্যাটেলের সঙ্গে বাংলার নেতৃবর্গের চিঠিপত্রগুলির দিকে তাকালেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January –June, 2023

এব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়দের স্বাধীন অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা যে তাঁর একেবারেই মনঃপুত ছিল না তা সর্দার প্যাটেল বার বার প্রকাশ করেছেন[8]। শ্যামাপ্রসাদকে তিনি আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, আপনি আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন এই পরিস্থিতি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে[9]। অন্য দিকে শরৎ বসুকে তিনি কিছুটা ভর্ৎসনার সুরেই লেখেন যে তিনি (দেশভাগের বিরোধিতা করে) নিজেকে সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন। উত্তরে শরৎ বসু লেখেন, বঙ্গ বিভাজনের পক্ষে আন্দোলন জমি পেয়েছে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে বলেই এবং গত বছর আগষ্টের ঘটনার পর হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধির ফলে। এই আন্দোলন মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি আরও লেখেন যে এটা ঠিক নয় যে, বাংলার হিন্দুরা সর্বসম্মতভাবে বিভাজন চাইছে। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দুই এর বিরোধী। বঙ্গ বিভাজনের পরিণতি যখন মানুষ সঠিকভাবে অনুধাবন করবে তখন এই আন্দোলন সমর্থন হারাবে। আমি ভীত যে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের দায়ী করবে দেশভাগ এবং বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগে সম্মতি দেবার জন্য[10]।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বঙ্গবিভাজনের পক্ষে চারশোর উপর যে পিটিশনগুলি পাঠানো হয়েছিল তার মাত্র চারটি পাঠানো হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের কাছে। বাকী সব পাঠানো হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের কাছে। এছাড়াও বঙ্গবিভাজনের পক্ষে সেসময় যে রাজনৈতিক সমাবেশগুলি হয়েছিল তার অধিকাংশই হয়েছিল কংগ্রেসের উদ্যোগে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে এবং কয়েকটি যৌথ উদ্যাগে[11]। সুতরাং ১৯৪৭ সালের বঙ্গবিভাজন শ্যামাপ্রসাদ কিংবা তাঁর দল হিন্দু মহাসভার একক কৃতিত্ব ছিল এমন দাবী করা সত্যের অপলাপ হবে। আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল মূলত পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে। কংগ্রেস এই আন্দোলনে সামনের সারিতে থাকলেও দলের নেতৃত্বের একটি ছোট অংশ এর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি, বিশেষ করে যাঁদের শিকড় ছিল পূর্ববঙ্গে, যেমন কিরণশঙ্কর রায় যিনি শরৎ বসু, আবুল হাশিমদের 'অখন্ড সার্বভৌম বাংলা' পরিকল্পনায় সামিল হন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবিভাজনের উদ্যোক্তারা কেউই দুই বাংলার সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনার মধ্যে আনেননি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানি থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে বঙ্গবিভাজনই কাম্য মনে হয়েছিল তাঁদের কাছে, বিভাজনের সুদূরপ্রসারী পরিণতি নিয়ে ভাবতে চাননি তাঁরা। তাই শরৎ বসুর প্রস্তাব এবং তার সঙ্গে আবুল হাশিম ও বিশেষ করে সোহ্‌রাওয়ার্দীর যোগ বাঙালি হিন্দুদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। এই বিকল্প প্রস্তাবে কিছু অস্বচ্ছতা থাকলেও, একেবারে উড়িয়ে দেবার মত ছিল না।

বাঙালি জনমত যে সেসময় বিভাজনকেই একমাত্র বিকল্প ভেবেছিল এমনটি একেবারেই নয়। কার্যত তা ছিল বহুধাবিভক্ত। বাঙ্গালি মুসলমানদের অনেকেই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের দাবীর সঙ্গে একমত ছিল না। শুধু তাই নয়, অনেকেই সেই সময় আশঙ্কা প্রকাশ করে যে বাঙালি মুসলমানরা বহিরাগত মুসলমানদের দ্বারা কোনঠাসা হতে পারে, যা অল্প দিনের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়[12]। বিভাজনের প্রশ্নে তফশিলি জাতি নেতৃত্বও দ্বিধাবিভক্ত ছিল, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতই সর্বসম্মত ছিল না। রাধানাথ দাস, বিরাট মণ্ডলের মত নেতারা

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January –June, 2023

প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করেন[13]। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালিদের একাংশও বিভাজনের বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁরা অনেকেই গান্ধির মতই মনে করতেন দেশভাগের ধারণা জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরিপন্থী। বাঙালি হিন্দুরা ইহুদী নয় যে তাদের হোমল্যান্ড দরকার। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের তাদের নিজেদের বাসভূমি থেকে উপড়ে ফেলা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত হবে না। শুধু শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায় নন, কংগ্রেসের আরও বেশ কয়েকজন নেতা, যেমন অখিলচন্দ্র দত্ত, লীলা রায়, কামিনীকুমার দত্ত প্রকাশ্যে বিভাজনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা দাবী তোলেন, হিন্দু বা মুসলমান কোনো বাঙ্গালিকেই যেন ঘরছাড়া হতে না হয়, তারা পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই থাকুক না কেন। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বঙ্গবিভাজনের পক্ষে প্রচারের স্রোতে এই বিরোধী কণ্ঠস্বর খড়কুটোর মত ভেসে যায়। ভূষণ পালরা দলে দলে বেড়িয়ে পরে তাদের স্বপ্নের হোমল্যান্ডের সন্ধানে[14]। শেয়ালদহ স্টেশন, ক্যাম্প, কলোনী, আন্দামান, দন্ডকারণ্য, মরিচঝাঁপি ঘুরে তারা অধীর বিশ্বাসের মত বলতে পারে 'আমরা তো এখন ইন্ডিয়ায়' বা আলমরা দেশভাগের বহুদিন পরেও ঠিক বুঝতে পারে না আদের আসল বাড়ি কোনটা[15]। স্বাধীনতার বছর খানেক যেতে না যেতেই উদ্বাস্তু সমস্যা ঘাড় থেকে নামাতে উদ্যোগী হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার। তখন না কংগ্রেস না হিন্দু মহাসভা কাউকেই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের পাশে সেভাবে আর দেখা যায়নি।

বঙ্গবিভাজন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার পুরস্কারস্বরূপ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নেহেরু মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। গান্ধি হত্যার পর তিনি যথেষ্ট কোণঠাসা হয়ে পরেন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। উত্তেজিত জনতা তাঁর কলকাতার বাসভবনে ইট পাটকেল ছোঁড়ে। মহাসভা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিছুদিন পরেই তিনি জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন - ১৯৫১ সালে অক্টোবরে। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনে শ্যামাপ্রসাদের ভারতীয় জনসংঘ ২৩৮টি আসনের মধ্যে ৮৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৯টি আসনে জয়ী হয়। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের ৩৪টি আসনের মধ্যে জনসংঘ বিজয়ী হয় মাত্র ২ টি আসনে। কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম থেকে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনসংঘ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় ১৯৫২ সালের নির্বাচনী ফলাফল থেকে। বঙ্গবিভাজন যদি শ্যামাপ্রসাদের অন্যতম কৃতিত্ব হয়ে থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি তার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনসংঘ স্বাধীনোত্তর বঙ্গরাজনীতিতে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যেত না। কংগ্রেসের দুর্গেও ধস নামতে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৪৯ সালে জুন মাসে দক্ষিণ কলকাতা আসনের পুনর্নির্বাচনে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। রাজ্য রাজনীতিতে বাতিলের দলে চলে যাওয়া শরৎ বসু প্রতিদ্বন্দ্বি কংগ্রেস প্রার্থী সুরেশচন্দ্র দাসকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করেন, যে নির্বাচনে পন্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, সীতারামাইয়া সহ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে বিবৃতি দেন। অসুস্থ শরৎ বসু তখন দেশের বাইরে সুইজারল্যান্ডের চিকিৎধীন। ইতিহাসে নিষ্ঠুর পরিহাসে পশ্চিমবঙ্গের রূপকাররা দ্রুত জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন।

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January –June, 2023

আর পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য ৩রা জুনই নির্ধারিত হয়ে যায়। ৩রা জুনের ঘোষণায় পরিষ্কার বলা হল যে প্রাদেশিক আইনসভা দুটি ভাগে বিভক্ত হবে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে। কোন একটি ভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা বিভাজের পক্ষে রায় দিলেই বিভাজন চূড়ান্ত হবে। বাংলার পশ্চিমাংশের হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধিদের অধিকাংশই যে বিভাজনের পক্ষে রায় দেবেন সেনিয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না। ২০শে জুনের ভোটাভুটির ফল যে কি হবে সেটা প্রায় সবারই জানা ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা ১০৬/৩৫ ভোটে বিভাজনের বিরুদ্ধে রায় দিলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা ৫৮/২১ ভোটে বিভাজনের পক্ষে রায় দেন এবং বঙ্গবিভাজনকে সুনিশ্চিত করেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটা ঠিক কেমন হতে চলেছে সেটা ২০শে জুন পরিষ্কার হয়নি। ১৯৪১ এর জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, দিনাজপুর ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। অন্যদিকে খুলনা ছিল হিন্দু সংখ্যগরিষ্ঠ। তাই এই বিভাজন ছিল তখনও শর্তাধীন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সীমানা কমিশন। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের দিনও পশ্চিমবঙ্গবাসী জানতে পারেনি কোন পশ্চিমবঙ্গ তারা পেল। জানলো তার দুদিন পরে ১৭ই আগষ্ট, যখন সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ২০শে জুনকে বেছে নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত সেনিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

তথ্যসূত্রঃ

[1] রায়, তথাগত, ***দ্যা লাইফ এন্ড টাইমস অফ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীঃ আ কমপ্লিট বায়োগ্রাফি,*** প্রভাত প্রকাশন, ২০১২
এই গোত্রের লেখাগুলির মধ্যে দেখতে পারেন
দীনেশচন্দ্র সিংহ এর লেখা ***শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গভঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ,*** গ্রন্থেরশ্মি, কলকাতা, ১৪০৭ বা অতি সাম্প্রতি প্রাকাশিত
ছন্দা চ্যাটার্জীর ***শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীঃ দ্যা হিন্দু ডিসেন্ট এন্ড দ্যা পার্টিশান অফ বেঙ্গল, ১৯৩২-১৯৪৭,*** রুথলেজ, ২০২০

[2] ব্যানার্জী, দিলীপ, ***ইলেকশন রেকর্ডসঃ আন আনালিটিক্যাল রেফারেন্স,*** স্টার পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ. ৩৯-৫৫।

[3] চ্যাটার্জি, জয়া, ***বেঙ্গল ডিভাইডেডঃ হিন্দু কমিউনালিজম এন্ড পার্টিশান, ১৯৩২-১৯৪৭,*** পৃ. ১০৩-১৪৯

[4] পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৫-১৩৯

[5] মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ(সম্পাদিত), ***শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ,*** মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.৪৬-৪৭

[6] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

[7] পূর্বোক্ত,, পৃ.৭০

[8] দাস, দুর্গা (সম্পাদিত), ***সর্দার প্যাটেল'স করোসপন্ডেন্স, ১৯৪৫-৫০,*** *৪র্থ খন্ড,* নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ১৯৭২, চিঠি নং ৪১, ৪৪

[9] পূর্বোক্ত, চিঠি নং ৪২

[10] পূর্বোক্ত, চিঠি নং ৪৭, ৪৮, ৪৯

[11] চ্যাটার্জি পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪-৫১

[12] *হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড,* ১৭ মে ১৯৪৭

[13] দ্রষ্টব্য হৈমন্তী রায়, " আ পার্টিশান অফ কন্টিনজেন্সি? পাবলিক ডিসকোর্স ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬-১৯৪৭", ***মর্ডান এশিয়ান স্টাডিস,*** নভেম্বর,২০০৯, সংখ্যা ৪২ নং ৬, পৃ. ১৩৫৫-১৩৮৪

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January –June, 2023

[14] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা "উদ্বাস্তু"

ভূষণ পাল গোটা পরিবারটাকে ঝড়ের মতো নাড়া দিলে।
কত দূর দিগন্তের পথ-
এখান থেকে নৌকা ক'রে ষ্টিমার ঘাট
সেখান থেকে রেলষ্টেশন-
কী মজা, আজ প্রথম ট্রেনে চাপাবি,
ট্রেন ক'রে চেকপোষ্ট,
সেখান থেকে পায়ে হেঁটে-পায়ে হেঁটে-পায়ে হেঁটে-
ছোট ছোলেটা ঘুমমোছা চোখে জিজ্ঞেস করলে,
সেখান থেকে কোথায় বাবা?
কোথায় আবার! আমাদের নিজের দেশে।

[15] দিবেন্দু পালিতের ছোটগল্প "আলমের নিজের বাড়ি"(মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ***ভেদ-বিভেদ-১***, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ.৪৬২-৪৭৯